আধুনিক ডাক্তারি সাম্রাজ্য, নতুন শিক্ষানীতি এবং মূর্ছাযোগ

স্থবির দাশগুপ্ত

নতুন শিক্ষানীতির রূপরেখায় ডাক্তারি বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ

ভারত সরকার মনোনীত পারদর্শীরা নতুন শিক্ষানীতি পেশ করেছেন। তাঁরা দেশের প্রাচীন সভ্যতার কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। তক্ষশীলা, নালন্দা, বাণভট্ট, চৌষট্টি কলা ইত্যাদির নজির দেখিয়ে তাঁরা বলেছেন, খণ্ড খণ্ড ধারণার বদলে মানবদেহ এবং মানবসমাজ নিয়ে অখণ্ড ('হোলিস্টিক') ধারণার নামই শিক্ষা। সমস্ত জনমানুষের মধ্যে পরিস্রুত পানীয় জল, শিক্ষার গুণমান, স্বাস্থ্য পরিষেবা, উন্নত পরিবহণ ইত্যাদি পৌঁছে দেওয়া এই শতকের দাবি। সেই দাবি মেটাতে গেলে শুধু নাক-উঁচু বিজ্ঞান আর কারিগরি ব্যবস্থা না, বরং চাই সমগ্র দেশ, জাতি এবং তার আবহ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা।

উদারপন্থী শিক্ষাই একবিংশ শতকের উপযুক্ত; তার জন্য চাই শিক্ষার অসংখ্য শাখা-প্রশাখার মধ্যে নিবিড় বন্ধন আর অনুপম ভাব বিনিময়। তারই মধ্যে থাকবে এক-একটা বিষয়ে বিশিষ্টতার ('স্পেশ্যালাইজেশন') অবকাশ। শিল্প সভ্যতার চতুর্থ যুগের উন্নত নাগরিক হতে গেলে শিক্ষার্থীকে শিক্ষার যাবতীয় ভাগ-বিভাগ সম্পর্কে বুনিয়াদী, কিন্তু স্পষ্ট ধারণা পেতে হবে। নইলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ। আমরা গবেষণা চালাব, কিন্তু বিদেশের নির্দেশে না, নিজেদের প্রয়োজনমতো, নিজেদের পায়ে ভর করে। পেশাদারি শিক্ষাকেও সামগ্রিক শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে দেখতে হবে যাতে একজন পেশাদার ন্যায়ধর্ম বোঝেন, দেশের মানুষের প্রয়োজনের কথা জানেন।

দেশের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নির্দিষ্ট বিষয় ছাড়াও যাবতীয় বিষয় নিয়ে চর্চার ব্যবস্থা করতে হবে; ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেই সার্বিক রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। ডাক্তারি শিক্ষাকে যুগোপযোগী করে তুলতে হবে; তার জন্য শিক্ষার্থীকে বুনিয়াদী স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য পরিষেবা সম্পর্কেও সচেতন থাকতে হবে। জনমানুষ বিচিত্র ধরনের চিকিৎসায় আগ্রহী, বিশ্বাসী, তাঁরা ঐতিহ্যেও বিশ্বাসী; জনমানুষের এই আন্তরিক বিশ্বাসকে মর্যাদা দেওয়া আমাদের কর্তব্য। আয়ুর্বেদ, যোগ, প্রাকৃতিক চিকিৎসা, য়ুনানি, সিদ্ধাই এবং হোমিওপ্যাথি, চিকিৎসার এই প্রথাগুলো আমাদের ঐতিহ্য; এদেরকে একসঙ্গে বলা হয়, 'আয়ুষ'।

যাঁরা আধুনিক ডাক্তারি বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনো করবেন তাঁদের 'আয়ুষ' সম্পর্কেও বুনিয়াদি ধারণা থাকতে হবে। পাশাপাশি, যাঁরা 'আয়ুষ'-এর বিভিন্ন শাখায় অধ্যয়ন করবেন তাঁদেরকেও আধুনিক ডাক্তারি বিজ্ঞানের বুনিয়াদি ধারণাগুলো অর্জন করতে হবে। এভাবেই সামগ্রিক শিক্ষার নতুন কাঠামো তৈরি হবে।

ডাক্তারি শিক্ষানীতি নিয়ে প্রতিক্রিয়ার রকমফের

অনেকেই প্রসন্নচিত্তে জানিয়েছেন, সরকার বহুদিনের পুরনো, জনপ্রিয় দাবিগুলোকে সম্মান জানাল। দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে আধুনিক ডাক্তারি বিজ্ঞান অতি দরিদ্র; সে খণ্ডবাদ ('রিডাকশনিজম')-এর চর্চা করে, তাই বাস্তবের পূর্ণ রূপ তার চোখে ধরা পড়ে না। সারা দুনিয়ায় তার সাম্রাজ্য বটে, সে বৃহৎ; কিন্তু সে অসুখী, অশান্ত। তার চালচলনেও অস্থিরতা। জনসাধারণ তার প্রতি বিরূপ, তাই প্রায় প্রত্যেক দেশেই বিকল্প প্রথার ডাক্তারি ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। কিন্তু সে এমন উদ্ধত আর ঈর্ষাকাতর যে বিকল্প প্রথাগুলোকে মূল্য দিতে চায় না। তার ভঙ্গিমায় আমরা যেন বলদর্পী দুর্যোধনের ভাষার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই,

> *—'সুখ চাহি নাই মহারাজ! জয়, জয় চেয়েছিনু, জয়ী আমি আজ।... দীপ্তজ্বালা অগ্নিঢালা সুধা জয়রস, ঈর্ষাসিন্ধুমন্থনসঞ্জাত, সদ্য করিয়াছি পান; সুখী নহি, তাত, অদ্য আমি জয়ী।...ঈর্ষা সুমহতী। ঈর্ষা বৃহতের ধর্ম...।'*

অমন আত্মগরিমায় কাতর বলে সে জনমানুষের বুনিয়াদি প্রয়োজন, সাধ-আহ্লাদকে অবহেলা করে এখন অতি-বিশেষজ্ঞতার ('সুপার স্পেশ্যালিটি') আড়ালে মুখ ঢাকতে চাইছে। কিন্তু তাতে আধুনিক ডাক্তারি বিজ্ঞানের সঙ্গে লোকসাধারণের বিস্তর ব্যবধান আরও বাড়ছে। মানুষজন যতটা নাচার তার চেয়ে অনেক বেশি আতঙ্কিত। আধুনিক ডাক্তাররা মানবিকতা হারিয়েছেন, ক্রমশ সাধারণ, ছাপোষা মানুষজনের হিংসা আর দ্বেষের পাত্র হয়ে উঠছেন। এই সমস্যার বীজ আধুনিক ডাক্তারি শিক্ষার মধ্যেই; এই শিক্ষা একসময় ছিল ইউরোপীয় ভাবধারায় পুষ্ট, ইদানীং মার্কিনি ঢঙে। কোনোটাই আমাদের দেশের উপযুক্ত না; তাই নতুন শিক্ষানীতি দরকার।

আধুনিক ডাক্তারির জনবিচ্ছিন্নতা নিয়ে ব্রিটিশ আমলেও আমাদের দেশে জনরব ছিল; শিক্ষিত মানুষজনের মধ্যেও বিরক্তি ছিল। তাঁরা আমাদের দেশীয় চিকিৎসাব্যবস্থার দিকে সরকারকে নজর দিতে বলেছেন, আয়ুর্বেদ চিকিৎসাকে আধুনিক ডাক্তারি পাঠক্রমের সঙ্গে যুক্ত করার দাবি জানিয়েছেন। প্রসিদ্ধ ভেষজবিজ্ঞানী স্যার রামনাথ চোপড়া আয়ুর্বেদিক ওষুধপত্র নিয়ে আধুনিক গবেষণার নতুন দিশা দেখিয়েছিলেন। ব্রিটিশ সরকার তেমন আমল না-দিলেও দাবিগুলো হারিয়ে যায়নি। এমনকি, ১৯৪৮ সালে 'চোপড়া কমিটি'র রিপোর্টেও একই কথা বলা হয়েছিল। স্বাধীন সরকার অবশ্য আয়ুর্বেদ নিয়ে গবেষণার ব্যবস্থা করেছিল, হোমিওপ্যাথির প্রভাবও স্বীকার করেছিল; কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক ডাক্তারি শিক্ষায় তাদের জায়গা হয়নি। অথচ দরকার ছিল।

আধুনিক ডাক্তারি আর কবিরাজির তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রায় একশো বছর আগে স্মরণীয় সাহিত্যিক পরশুরাম (রাজশেখর বসু) কয়েকটি প্রণিধানযোগ্য কথা বলেছিলেন। কথাগুলো আজও জীবন্ত। যেমন,

> *'....তোমরা চিকিৎসায় বিলাতী কুসংস্কার ও বিলাসিতা আমদানি করিয়াছ। আমাদের ঔষধপথ্য সমস্তই সস্তা, এদেশেই পাওয়া যায়, গরিবের উপযুক্ত।.... মোট কথা; তোমাদের বিজ্ঞান এক পথে গিয়াছে, আমাদের বিজ্ঞান অন্য পথে গিয়াছে। কিছু তোমরা জান, কিছু আমরা জানি।...'*
>
> *'....বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের উপর চিকিৎসাবিদ্যা যতটা নির্ভর করে, অল্পপরীক্ষিত অপরীক্ষিত কিংবদন্তীমূলক ও ব্যক্তিগত মতের উপর ততোধিক নির্ভর করে। কি প্রাচ্য কি প্রতীচ্য সকল চিকিৎসাপদ্ধতি সম্বন্ধেই এই কথা খাটে।'*

আধুনিক ডাক্তারদের মতে, পুরাতনী চিকিৎসাগুলোর দুর্বলতা প্রচুর; তারা অবিজ্ঞান বা অপবিজ্ঞানে ভরপুর। কিন্তু দুর্বলতা নেই এমন শাস্ত্রও তো নেই। জ্ঞান সর্বত্র আহরণযোগ্য। নতুন শিক্ষানীতি এই সার কথাটা স্পষ্ট করে বলতে পেরেছে। অনেকে ভাবেন, 'আয়ুষ'-এর প্রতি সরকারের পক্ষপাতিত্ব আছে, তাই 'আয়ুষ' নিজেই একটা স্বতন্ত্র, স্বাধীন মন্ত্রক; সেখানে সরকার অকারণে অঢেল টাকা ঢালে। এই অভিযোগ অর্থহীন; বরং চিকিৎসার পুরনো প্রথাগুলো আমাদের দেশের রত্নভাণ্ডার। সেই সম্পদের যত্ন নিতে হবে। প্রাচীন প্রথাগুলোকে লালন করে আধুনিক প্রথার ভুলত্রুটি শুধরে নিতে হবে। এটাই নতুন যুগের দাবি এবং নতুন শিক্ষানীতির মর্মকথা।

আবার উলটোদিকে, এই শিক্ষানীতি নিয়ে অনেকেই যারপরনাই অপ্রসন্ন। বিশেষ করে, আধুনিক ডাক্তারদের সর্ববৃহৎ সংস্থা, 'ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন' ('আই এম এ') প্রকাশ্যেই জানিয়েছে যে, নতুন শিক্ষানীতির পরিণামে ডাক্তারি শিক্ষা ব্যবস্থাটাই রসাতলে যাবে। কারণ চিকিৎসার আধুনিক, বৈজ্ঞানিক প্রথার সঙ্গে আধা-বৈজ্ঞানিক বা অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলোকে মিশিয়ে দেওয়ার অর্থ, দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থাকেই খর্ব করে, নপুংসক করে দেওয়া। আধুনিক আর 'আয়ুষ', এই দুই ধরনের প্রথাকে সমান মর্যাদা দেওয়ার অর্থ চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ইতিহাসকে অস্বীকার করা। অথচ অধ্যাত্মবাদ আর যান্ত্রিক বস্তুবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেই আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান নিজের জায়গা গড়ে নিয়েছিল; ইতিহাস তার সাক্ষী।

ডাক্তারদের অন্যান্য সংগঠন এবং সভাসমিতিতেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া। যেমন, চিকিৎসার রূপ আর পদ্ধতি নির্ভর করে বিশ্ববীক্ষার উপর; ভিন্ন বিশ্ববীক্ষা পাশাপাশি থাকতে পারে, কিন্তু তাদের মিলন সম্ভব না। আধুনিক ডাক্তারির ক্ষমতা যে অসীম না, সেকথা সে নিজেই স্বীকার করে। তাই আজকাল বহু চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে আধুনিক চিকিৎসার পাশাপাশি পরিপূরক এবং বিকল্প চিকিৎসা ('ক্যাম' বা 'কমপ্লিমেন্টারি এন্ড অলটারনেটিভ মেডিসিন')-এর ব্যবস্থাও থাকে, গবেষণাও চলে। এসব নতুন কিছু না; কিন্তু তাতে একথা প্রমাণ হয় না যে, আধুনিক আর প্রাচীন প্রথাগুলোর মূল্য বা উপকারিতা সমান সমান।

প্রাচীন পদ্ধতিগুলো নিয়ে গবেষণা করতে গেলেও সমস্যা। আধুনিক বিজ্ঞান পরীক্ষানিরীক্ষার উপর নির্ভর করে, সেই প্রমাণই গ্রাহ্য। অন্যদের বেলায় সেই প্রমাণ গ্রাহ্য নাও হতে পারে; এসব নিয়ে বিরোধ, মতভেদ লেগেই থাকে। সর্বজনগ্রাহ্য উপায় আজও অজানা। তা সত্ত্বেও, গবেষণায় যদি কোনো চিকিৎসাপদ্ধতির সারবত্তা প্রমাণিত হয় তাহলে আধুনিক বিজ্ঞান মেনেই নেবে; সেই উদারতা তার চিরকাল ছিল, আজও আছে। কিন্তু তার বদলে একটা আধুনিক, ব্যবহার্য পদ্ধতির সঙ্গে সেকেলে, সংশয়জনক পদ্ধতি মিশিয়ে রাখলে যা হয় তাকে বলে, শবপোড়া আর মড়াদাহ। তাতে যেমন ভাষার আদ্যশ্রাদ্ধ হয় তেমনি চিকিৎসাশাস্ত্রেরও সমাধি রচনা করা হয়। তাতে সমাজের ক্ষতি অনিবার্য।

ডাক্তারি একটা ব্যবহারিক বিদ্যা। সেই হিসেবে, আমাদের বিচিত্র সমাজে ডাক্তারির বহুতত্ত্ব ('মেডিকেল প্লুরালিজম') টিঁকে থাকতে পারে, কেননা মরণ কামনা করলেই তত্ত্বের মরণ হয় না। কিন্তু নতুন সভ্যতার দিকে তাকিয়ে আমরা কোন তত্ত্বকে তুলে ধরব, পরিশীলিত করব, তা স্থির করে দেয় রাষ্ট্রের চরিত্র। সেদিক থেকে আমাদের রাষ্ট্রকে প্রগতিশীল বলা যাচ্ছে না। ঝাল ঝোল আর অম্বল আহারের রকমারি উপাদান ঠিকই; কিন্তু তাদেরকে একই পাত্রে মিশিয়ে দিলে যা তৈরি হয় তা আহার্য না। রাষ্ট্র যদি তাকে আহার্য হিসেবে মেনে নেওয়ার বায়না ধরে তাহলে তার পিছনে উদারতা নেই, বরং অন্য কোনও মতলব আছে। আধুনিক ডাক্তারি বিজ্ঞান নিজেই স্বভাবে উদার, তাকে উদারতার শিক্ষা দেওয়া অর্থহীন।

বরং 'আয়ুষ' নামে যেসব চিকিৎসাপদ্ধতির কথা বলা হয়েছে তার প্রত্যেকটিই আধুনিক প্রথার বিরোধী, চরিত্রেও অনুদার। তাদেরকে আধুনিক প্রথার সঙ্গে জুড়ে দিলেই তারা উদার হয়ে যাবে না, বরং নবযৌবনরসে সিক্ত হয়ে ডাক্তারির অঙ্গনে মত্ত হস্তির মতো আচরণ করবে। নতুন শিক্ষার্থীও হয়ে যাবেন এক দিকশূন্যপুরের অভাগা যাত্রী। তাই এই শিক্ষানীতিকে বাস্তবে প্রয়োগ করা পণ্ডশ্রমই হবে। এই মুহূর্তে দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার যা করুণ অবস্থা তাতে এই পণ্ডশ্রমের বিলাসিতা মানায় না। সরকারের শপথনামা দেখে মনে হয়, এই নীতির পিছনে জনকল্যাণের উদ্দেশ্য নেই; আছে কোনো সস্তা রাজনীতির প্রেরণা। তাই বিশেষজ্ঞতা থেকে অতি-বিশেষজ্ঞতা যে আসলে একটা উত্তরণ, আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যেই যে এই উত্তরণের আহ্বান আছে সেকথা স্বীকার করতে অনুগত শিক্ষাবিদরা গড়িমসি করেন।

একথা ঠিক যে, পরশুরামের মতো মুক্তমনা মানুষ চিরকালই বিরল। বিজ্ঞান আর অপবিজ্ঞান নিয়ে তাঁর আলোচনা আজও পাঠযোগ্য। তিনি কবিরাজির সঙ্গে ডাক্তারির মিলন ঘটাবার পথ খুঁজেছিলেন সত্যি; কিন্তু একই সঙ্গে আরও কিছু বলেছিলেন যা আরও বেশি প্রণিধানযোগ্য। যেমন,

> *'যে পদ্ধতি সরকারী সাহায্যে পুষ্ট তাহাই সাধারণের সহজলভ্য। যদি রাজমত বা জনমত বহু পদ্ধতির অনুরাগী হয় তবে অর্থ ও উদ্যমের সংহতি খর্ব হয়, জনচিকিৎসার কোনও সুব্যবস্থিত প্রতিষ্ঠান সহজে গড়িয়া উঠিতে পারে না। অতএব উপযুক্ত পদ্ধতি নির্বাচন যেমন বাঞ্ছনীয়, মতৈক্য তেমনই বাঞ্ছনীয়। .... সরকারী অর্থসাহায্য যাহাকেই দেওয়া হোক তাহা সাধারণেরই অর্থ, অতএব সাধারণের এ বিষয়ে উদাসীন থাকা অকর্তব্য। অর্থ ও উদ্যম যাহাতে যোগ্য পাত্রে যোগ্য উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয় তাহা সকলেরই দেখা উচিত।'*

'আয়ুষ'-এর মাথায় সরকারী আশীর্বাদের হাত থাক, এই দাবি পুরনো ঠিকই, কিন্তু সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবার দাবিও তো পুরনো দাবি। সরকার তা গ্রাহ্য করেনি, বরং নানান ছলচাতুরি দেখিয়েছে। আজ যদি সরকার ভাবে যে, যার সামর্থ আছে সে আধুনিক ডাক্তারির আশ্রয়ে থাকবে আর বাকিরা 'আয়ুষ'-এর শরণাপন্ন হবে, তাহলে বুঝতে হবে, চিকিৎসা পরিষেবায় সরকার শ্রেণিভেদ চায়। এ হল, জনস্বাস্থ্যের পুরনো দাবিকে এড়িয়ে যাওয়ার নতুন চালাকি। এ অন্যায়।

****

ডাক্তারি শিক্ষানীতি নিয়ে প্রতিক্রিয়ার রকমফের থেকে মনে হয়, যুযুধান বক্তব্যগুলোকে আরও তলিয়ে দেখা উচিত হবে। অতএব, নতুন নীতি নিয়ে সরকার কতটা যুক্তিশীল, কতটা ইতিহাস সচেতন আর আন্তরিক তা বুঝতে গেলে সেই নীতির মর্মস্থলে যেতে হবে।

ডাক্তারি শিক্ষার মানে কী?

ডাক্তারি শিক্ষার আলাদা কোনও মহিমা নেই; পেশাদারি শিক্ষা আসলে সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থারই অঙ্গ। শিক্ষা নিজেই একটা সামগ্রিক উদ্যোগ। তার বুনিয়াদি উপাদানগুলো সর্বত্র একই থাকে। লোকসাধারণ যে পেশাদারদের মান্য করে, গণ্য করে, তার কারণ তাঁরা ধরে নেন যে, শিক্ষার বুনিয়াদি উপাদানগুলো তাঁদের মধ্যে আছে। কিন্তু এই ধারণায় ভাঙন এসেছে; ভাঙন তীব্র হয়েছে গত নব্বুইয়ের দশক থেকে। কেন এমন হল, গলদ কোথায় তা নিয়ে নতুন শিক্ষানীতিতে তেমন বিশ্লেষণের চিহ্ন নেই। শুধু শিক্ষা, বিশেষ করে পেশাদারী শিক্ষা নিয়ে তাঁরা যে যথেষ্ট উদ্বেল তার নিদর্শন আছে। সেটা দোষের না, উদ্বেগও ঠিক; তবে বিশ্লেষণ আরও জরুরি।

আধুনিক ডাক্তারি শিক্ষার খামতি নিয়ে ডাক্তারি পত্র-পত্রিকাগুলো বহুকাল ধরে নিজেরাই সরব। যেমন, আধুনিক ডাক্তারি শিক্ষার্থী একথা বোঝেন যে, তাঁর শাস্ত্র আগের চেয়ে উন্নত, তাই রোগবিরোগের অনেক সমস্যার সুরাহা করতে পারে। কিন্তু একথা বুঝতে পারেন না যে, এই শাস্ত্র জনস্বাস্থ্যের বুনিয়াদি সমস্যাগুলোর সুরাহা করতে পারে না। বরং তিনি ভাবতে শেখেন, আজকের দিনে যথেষ্ট টাকা ফেললেই স্বাস্থ্য সুরক্ষিত থাকবে। অথচ অর্থনির্ভরতা অতি প্রাচীন ধারণা, তার মধ্যে আধুনিকতার ছোঁয়া নেই। তাহলে আধুনিক হওয়া যাবে কীভাবে? প্রাচীন ঐতিহ্যের দিকে তাকিয়ে, এটা ওটা সেটা নিয়ে অনেক কিছু জানলেই কি ডাক্তারির নতুন শিক্ষার্থী আধুনিক হতে পারবেন?

একটা শাস্ত্র কতটা শক্তিশালী তার চেয়েও বড় কথা হল, সে জনমানুষের জন্য কতটা উপকারী। এই শিক্ষা আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের অবদান; অথচ আধুনিক ডাক্তারি শিক্ষার মোহজালে জড়িয়ে থাকলে সেকথা বোঝা যায় না, জনমানুষের প্রতি কৌতূহল জন্মায় না। জনস্বাস্থ্যের মাত্র পাঁচটি বনিয়াদ, লোকসাধারণের জন্য পানীয় জল, মাথার উপরে ছাদ, তিন বেলা আহার, শৌচাগার এবং নারীর হাতে আর্থিক ক্ষমতা। কেবল রাষ্ট্রই যে সেই বনিয়াদ তৈরি করতে পারে, এই বুনিয়াদি শিক্ষা আধুনিক ডাক্তারি শাস্ত্রে নেই। নতুন শিক্ষানীতি এই খামতির আভাস দেয়, কিন্তু মনে হয়, ওটা কথার কথা। কারণ, সত্যিই যদি ছাত্রের মনে কৌতূহল জাগানই লক্ষ্য হত তাহলে শাস্ত্রীয় মিশ্রণের আড়ম্বর দরকার হত না।

অথচ কৌতূহলই শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র, বাকি সবই শাখাপ্রশাখা। কৌতূহল জাগে না বলে ডাক্তারি শিক্ষার্থী প্রগতি বোঝেন, প্রগতির কুফল বোঝেন না! ডাক্তারি বিজ্ঞানের জয়যাত্রা নিয়ে যত উল্লসিত হন, তার পরাজয়যাত্রার কথা

মনে থাকে না। জোসেফ ক্রোনিন (১৮৯৬—১৯৮১) ছিলেন একজন স্কটিশ ডাক্তার এবং সুলেখক। তাঁর 'এম আর সি পি' পরীক্ষায় পরীক্ষক বলেছিলেন, তুমি খুব ভালো পরীক্ষা দিয়েছ; কিন্তু একটা শেষ প্রশ্ন তোমাকে করব, বলতে পার, ডাক্তারি বিজ্ঞানের সবচেয়ে দরকারি বিষয়টা কী? ক্রোনিন বলেছিলেন, সবচেয়ে দরকারি কথাটা হল, কোনও কিছুকেই বিনা প্রশ্নে মেনে না-নেওয়া! কৌতূহলের এটাই প্রাথমিক সোপান। আমাদের চেনা-জানা ডাক্তারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এই সোপানটি নেই বলেই শিক্ষার সংস্কার চাই। কিন্তু সেই সোপানের হদিশ ভাবগম্ভীর, নতুন শিক্ষানীতিতে নেই।

তার বদলে শিক্ষার্থীকে নানাবিধ শিক্ষায় অবগাহন করানোর কথা আছে; কিন্তু মূল গলদ থেকে পরিত্রাণের দিশা নেই। তক্ষশীলা আর নালন্দা দেখানোর আগে বরং বলার ছিল, শিক্ষার্থী আজকাল প্রশ্নব্যাকুল হন না কেন? যতটা ক্রিয়াশীল হন ততটা চিন্তাশীল হন না কেন? প্রাচীন বা নাতিপ্রাচীন শাস্ত্রগুলোর সঙ্গে ঠিকঠাক পরিচয় ঘটলে তাঁরা হয়তো ডাক্তারি শাস্ত্রের বিবর্তন নিয়ে কিছুটা সজাগ হতে পারেন, তার বেশি আর কী হবে? তার জন্যই কি গন্ধমাদন তুলে আনার এলাহি ঘটা? একথা ঠিক যে সাহিত্য, দর্শন এবং সঙ্গীত শিক্ষা যেকোনও পেশাদারি শিক্ষার জমিকে উর্বর করে তোলে, শিক্ষার্থী মননশীল হয়, দৃষ্টি প্রসারিত হয়। কিন্তু তাতে অতীতের প্রতি মুগ্ধতা, বিহ্বলতারও জন্ম হতে পারে। স্মৃতিমেদুরতা নতুন প্রশ্নের জন্ম দেয় না।

অথচ অসংখ্য প্রশ্নের বীজ, চ্যালেঞ্জ করার অজস্র উপাদান আধুনিক ডাক্তারি বিজ্ঞানের পঠন, গঠন আর চলনের মধ্যেই লুকিয়ে আছে। এই শাস্ত্র প্রতিদিন ব্যাধির বিরুদ্ধে নাটকীয় যুদ্ধ করতে শেখায়; কিন্তু প্রতিদিনই যুদ্ধরত ডাক্তাররা বুঝতে পারেন, ব্যাধির জন্ম আর গতিপথ পালটে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাই শিক্ষকের কাজ আধুনিক ডাক্তারি বিজ্ঞানকে চ্যালেঞ্জ করতে শেখানো; তা নইলে সে নিজের দুর্বলতা শুধরে নেবে না, শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তিও বিকশিত হবে না। এইসব না-করে শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীকে প্রাচীন আর অর্বাচীনের মিলনমেলার দিকে আকুল নয়নে তাকিয়ে থাকতে বলেন তাহলে উত্তরণের দিশা মিলবে না। কারণ, সেই মেলাতেও কুয়াশা, আলোর রোশনাই সেখানে নেই।

নতুন শিক্ষানীতিতে সমগ্রতা বা 'হোলিস্টিক' ধারণার কথাটা এমনভাবে এসেছে যেন অনেক কিছু মিশিয়ে দিলেই তাকে 'সমগ্র' বলা যায়। এই ধারণাটা যান্ত্রিক। একথাও ঠিক না যে, আধুনিক চিকিৎসার ধারণা আর 'হোলিস্টিক' ধারণা, দুটি একে অপরের বিপরীত; এটা ঠিক হলে ওটা ভুল। 'হোলিস্টিক' মানে, রোগী আর তার রোগকে বিচ্ছিন্নভাবে না-দেখে একটা পূর্ণ চিত্র হিসেবে দেখা। সমগ্র মানে, একটা ভারসাম্য; প্রকৃতিতে সেই ভারসাম্য থাকে, 'খণ্ডবাদ' তা বুঝতে চায় না। 'খণ্ডবাদী', আধুনিক ডাক্তারি শাস্ত্র রোগকে বুঝতে গিয়ে কোষীয় স্তরে পৌঁছে গিয়েছে; সেই অতল সমুদ্রে ডুবুরি নামিয়ে সে রোগের নির্দিষ্ট কারণ খুঁজে বেড়াচ্ছে। তার জন্য নতুন নতুন প্রযুক্তির হাত ধরতে হচ্ছে। তার এই গভীর সন্ধানব্রত মিথ্যে না।

কিন্তু ব্রত পালন করতে গিয়ে কখন যেন সে রোগীকে হারিয়ে ফেলছে; তার অনবদ্য, অভাবনীয় আবিষ্কারগুলো রোগীর পূর্ণ সত্তার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছে না। খাপ খাওয়াতে গিয়ে নতুন নতুন সমস্যা, নতুন রোগ তৈরি হচ্ছে। একে বলে, 'আয়াট্রোজেনি'। তার মানে, সে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে। আধুনিক শিক্ষকের কাজ, এই খামতিটা ধরিয়ে দেওয়া। তার বদলে নতুন শিক্ষানীতি সমগ্রতার যে-ধারণা এনেছে তাতে কিছুই স্পষ্ট হয় না। একথা ঠিক যে, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে সমগ্রতার ধারণা ছিল; কিন্তু এও ঠিক যে, সেই ধারণা যথেষ্ট বিকশিত হতে পারেনি। সমগ্রতার ধারণা আধুনিক ডাক্তারি বিজ্ঞানেও আছে; কিন্তু খণ্ডবাদী দৃষ্টিভঙ্গি আর বাণিজ্যমুখিতার চাপে তা বিকশিত হতে পারে না। আধুনিক প্রতিষ্ঠানও তা চায় না।

তাই আধুনিক বিজ্ঞান প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করে; সে ভাবে, ভারসাম্য জিইয়ে রাখলে 'উন্নয়ন' হবে না, আমরা পিছিয়েই থাকব। ভারসাম্য আমাদের সরকারও বোঝে না। চলমান 'করোনা' সংকটেও দেখা গেল, কিছু প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে সরকার কীভাবে ব্যাপক জনমানুষকে অকূল পাথারে ঠেলে দেয়। অশিক্ষার সামনে এখন আমরা নতজানুপ্রায়। প্রায়ই আমাদের শুনতে হয়, আয়ুর্বেদই সর্বপ্রাচীন ডাক্তারি শাস্ত্র আর বেদই সর্বপ্রাচীন লিখন। অথচ দুটোই ভুল, মিশরীয় চিকিৎসাশাস্ত্র ('প্যাপিরাস') এবং 'গিলগামেশ' কাব্য প্রাচীনতর। শোনা যায়, সংগীত থেকে চিকিৎসাশাস্ত্র, প্রাচীন ভারতের সবকিছুই বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ। আসলে সর্ববিষয়ে 'ফার্স্ট' হওয়ার অভিলাষ নিজেই একটা ব্যাধি। তাই ব্যাধিগ্রস্ত মন, দুর্বল ইতিহাস চেতনা আর মোহমুগ্ধতার ছাপ নতুন শিক্ষানীতিতে থেকেই যাচ্ছে।

তার আরও প্রমাণ আমরা ক্রমশ পেতে থাকব। তবে তার আগে ভাবতে হয়, শিক্ষানীতি নিয়ে সরকারের এত চঞ্চলতা

কীসের? শোনা যায়, সরকার নাকি কর্তব্য বোধের পরিচয় দিয়েছে। ওদিকে কূটনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, কোথাও তো অমন প্রখর কর্তব্য বোধের নমুনা পাচ্ছি না; তাই সংশয় জাগে, ডাক্তারি শিক্ষার অন্দরমহলেই বা এত উৎসাহী পদচারণা কেন? সরকার অবশ্য একটা কারণ দেখিয়েছে, নতুন শতক ঘরে ঢুকে পড়েছে, আমাদের এখনই সেজেগুজে তৈরি হতে হবে।... বেশ! কিন্তু কীভাবে?

একুশ শতকে আধুনিক ডাক্তারি সাম্রাজ্য

আধুনিক ডাক্তারি বিজ্ঞান যে বিশ্ব জুড়ে সাম্রাজ্য গড়েছে সেকথা নতুন করে বলা বাহুল্য। কিন্তু তার যাত্রাপথ কোনোদিন মসৃণ ছিল না; প্রথম থেকেই তার অন্দরে-কন্দরে অসংখ্য প্রশ্ন উঠেছে, তর্ক-বিতর্কও। বেশ কিছুকাল ধরে তার তীব্রতা এমনভাবে বেড়েছে যে মনে হচ্ছে, দীর্ঘ পথযাত্রার পর সাম্রাজ্যবাদী এখন ক্লান্ত, অবসন্ন। কারণ, আধুনিক ডাক্তারির অট্টালিকায় দুটো পুরনো রন্ধ্রপথ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে, একটা ব্যবহারিক, আরেকটা তাত্ত্বিক ('হায়েটাস থিয়োরেটিকাস')। ব্যবহারিক রন্ধ্র হল, আধুনিক ডাক্তারির লাগামছাড়া ব্যয়বহুলতা; এই রন্ধ্রপথ বুজিয়ে ফেলার কোনো মন্ত্র তার ধর্মগ্রন্থে নেই, বুজিয়ে ফেলতে সে চায়ও না। কারণ, মুনাফা থেকে অতি-মুনাফার দিকে যাওয়াই তার নিয়তি। আর তাত্ত্বিক রন্ধ্র হল, তার 'খণ্ডবাদী' দৃষ্টিভঙ্গি। তার অনেক দোষ, কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গিই অতি-মুনাফার সঙ্গে মানানসই। তাই সে নিরুপায়।

একথা ঠিক যে, খণ্ডবাদী দৃষ্টিভঙ্গি স্বল্পমেয়াদি ('অ্যাকিউট') রোগগুলোর বেলায় সুফল দেয়; কিন্তু এও ঠিক যে, দীর্ঘমেয়াদি ('ক্রনিক') অসুখ-বিসুখের বেলায় তা বারবার হোঁচট খায়। তার উপর, মনোভাবে সে যেন জঙ্গি, পৃথুলতা থেকে 'করোনা', ক্যানসার থেকে করোনারি, সবকিছুর বিরুদ্ধেই সে 'হাতে বন্দুক পায়ে বন্দুক' নিয়ে 'যুদ্ধ' করতে শেখায়। ওদিকে প্রযুক্তির অভাবনীয় বিচ্ছুরণ ছাড়া, বিশেষ করে ওষুধপত্রের বেলায় আধুনিক ডাক্তারি বিজ্ঞান তেমন অভিনব অবদান আর রাখতে পারছে না। 'নতুন' বলে যা দেখছি, পুলকিত হচ্ছি তার বেশির ভাগই পুরাতনের চমকপ্রদ পুনরাবৃত্তি। উপরন্তু, ওষুধের কুফল নিয়ে চিরায়ুষ্মান সমস্যা, তা থেকে নিষ্ক্রমণের পথ নেই। এ এক সংকট; বাইরে যতই দাপট দেখাক না-কেন, আসলে সাম্রাজ্য এখন ক্ষয়িষ্ণু।

তাই অনেকে বলেন, এখন চলছে ডাক্তারি বিজ্ঞানের পতনের যুগ। সেকথা ধনী-দরিদ্র সব দেশই জানে বলে সব দেশেই নিজের মতো করে কোনো না-কোনো বিকল্পের খোঁজ চলছে। সাম্রাজ্য নিজেও তার দুর্বলতার কথা জানে, বিকল্পের খোঁজও চালিয়ে যায়। তাহলে আমাদের দেশের সরকার এখন কী করবে? সে কি এই সাম্রাজ্যই যাতে জনমুখী হয় তার ব্যবস্থা করবে, নাকি সাম্রাজ্যের পতনই চাইবে? পতন চাইলে বলতে হবে যে, সে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী। তাহলে তার কাজ হবে, একটা স্বাধীন, বিকল্প, স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের ভিত্তি তৈরি করা, সর্বজনীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা; তার জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো, অবকাঠামো তৈরি করা। চিন্তার দিক থেকে তাকে 'হোলিস্টিক' হতেই হবে। সেই কাজ বৈপ্লবিক; শিক্ষানীতিতে অবশ্য তার আভাস আছে।

আর যদি সে এই সাম্রাজ্যকেই জনমুখী করতে চায় তা হলে তা আর 'সাম্রাজ্যবাদ' থাকে না, তখন তার কাজ, দুটো রন্ধ্রপথ বুজিয়ে ফেলা। সেই কাজও দুরূহ। প্রথম রন্ধ্রটা বোজাতে গেলে সরকারকে জনমানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার যাবতীয় খরচখরচা নিজের হাতে নিতে হবে, স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়বরাদ্দ অনেকটা বাড়াতে হবে। এটা সে করতে চায় না, তার বদলে নানান ভেলকি দেখায়। এবার হাতে রইল দ্বিতীয় রন্ধ্রপথের সমস্যা, তাত্ত্বিক রন্ধ্র। কিন্তু 'খণ্ডবাদ' তো একটা দার্শনিক সমস্যা। সেই রন্ধ্র বোজাতে গেলে চাই পালটা একটা স্বাস্থ্য দর্শন, আরও গভীর, আরও উদার কোনও দৃষ্টিভঙ্গি। সেই কাজও বৈপ্লবিক; কিন্তু অমন কাজ করতে গেলে সাম্রাজ্যের স্বার্থে আঘাত লাগে। তাহলে সে কী করবে? তার চরিত্র এতদিনে আমাদের কাছে স্পষ্ট, ধূর্তামিই তার মূল মন্ত্র। তাই সে একটা তৃতীয় পন্থা নেয়।

সে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলে; কিন্তু সামগ্রিকতার ভুয়ো, যান্ত্রিক ধারণা পেশ করে; 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ'-এর মতো! সে জানে যে, আধুনিক চিকিৎসার সামনে জনমানুষ অগত্যা মাথা নীচু করে থাকলেও তার কাছে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ, লোকায়ত চিকিৎসাই প্রিয়। সেই গলিপথ দিয়েই নতুন সরকার তার নতুন শিক্ষানীতিতে উদ্ভট 'হোলিস্টিক' ধারণাটি ঢুকিয়ে দেয়। সে এমন ভাব দেখায় যেন একটা নতুন কথা বলছে, দেশের স্বাধীন সত্তার কথা বলছে, লোকায়ত শাস্ত্রগুলোকে আধুনিক পঠনপাঠনের ভূমিতে নিয়ে এসে কোনও যান্ত্রিক মিশ্রণ না, বরং একটা মিলন ঘটাতে চাইছে। তাই লোকে তাকে সাম্রাজ্য বিরোধী বলে মেনে নেবে, সে আরও জনপ্রিয় হবে। আধুনিক ডাক্তারি শাস্ত্রের রন্ধ্রপথ বোজাতে সে চায় না, ওটা তার কম্মও না।

একটা নতুন, সংহত, একবিংশ শতকের উপযুক্ত স্বাস্থ্য বিজ্ঞান নাকি সে তৈরি করে নেবে। এই তার স্বপ্ন। তাই বারবার ঐতিহ্যের কথা বলা। কিন্তু ঐতিহ্যের কথা হিটলারও বলেছিল, বারবারই বলেছিল; দেশাভিমান, জাত্যাভিমানের কথা ফাসিস্তরা তুলেই থাকে। তাদের কাছে নতুন কোনো ভক্তিমন্ত্র নেই। তারাও স্বাধীনতার বাসনা প্রচার করে, তবে তা পালটা সাম্রাজ্য গড়ার লোভে। দাদাগিরি আমাদের রাষ্ট্রের রক্তে; তাই সরকার ভাবে, ডাক্তারির নতুন শিক্ষানীতি যে-বিকল্প বিজ্ঞানের জন্ম দেবে তার বাজার বিশাল। প্রথমে স্বদেশেই তার স্বপ্নের পটভূমি তৈরি হবে, 'মেক ইন ইন্ডিয়া'; তারপর বিদেশ যাত্রা। নানান দেশে লোকায়ত চিকিৎসাগুলোর ছড়িয়ে পড়ার কথা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও স্বীকার করে; তাই নতুন শিক্ষানীতি একটা সমর্থনও পেয়ে যায়।

এইভাবে নাকি আমরা শিল্পসভ্যতার 'চতুর্থ' যুগে পা ফেলতে পারব। ভাবনাটা তুচ্ছ না, তবে 'গামলাতে ফুটো ছিল আগে কেউ দেখেনি'!

শিল্পসভ্যতার 'চতুর্থ' যুগ যে সমাগত তা সত্যি; কিন্তু কেমন সেই যুগ? আধুনিক ডাক্তারি শাস্ত্রের উত্থান আর বিকাশ ঘটেছিল ইউরোপের শিল্পবিপ্লবের হাত ধরে। শিল্পসভ্যতা ক্রমশ তার ধরন-ধারণ পালটিয়েছে, উৎপাদনের রীতি-নীতি পালটে গেছে; আর এইভাবে এক-একটা পর্যায় আমরা পার করে এসেছি। আধুনিক ডাক্তারি বিজ্ঞানও মানুষের দাবির সঙ্গে তাল মিলিয়ে, ক্রমশ উন্নত হয়েছে। চিকিৎসাবিদ্যার সঙ্গে বাণিজ্যের সম্পর্ক চিরকালই ওতপ্রোত। কিন্তু বণিকবৃত্তির জন্য চাই মূলধন, চাই মহাজন। শিল্পসভ্যতায় সেই মূলধনের নাম, শিল্পপুঁজি। সেও সমাজের উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজের চলন যুগে যুগে পালটে নিয়েছে। সেই যুগগুলো এক-একটা বিপ্লবই বটে; মানব সভ্যতায় প্রগতির নমুনা। সামন্তবাদী, ব্যক্তিগত উৎপাদনকে পুঁজিবাদ একটা সামাজিক রূপ দিতে পেরেছিল বলেই সে প্রগতিশীল।

আগুন আবিষ্কারই বিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রথম বিপ্লব। তার পর মানব সভ্যতার সবচেয়ে বড় আবিষ্কার জল আর বাষ্পের উন্নততর ব্যবহার, মানে বাষ্প শক্তি বা স্টিম ইঞ্জিন। উৎপাদনের উপায় আর রূপ পালটে গেল; একে বলে, 'প্রথম' শিল্প বিপ্লব। শারীরিক শ্রমের বদলে এল নতুন নতুন যন্ত্র; উৎপাদনের গতি বাড়ল, পরিমাণও। সামাজিক অর্থনীতিতে প্রভুত্ব করার দায় বণিকদের হাত থেকে ক্রমশ চলে গেল 'শিল্পপতি'দের হাতে। এই বিপ্লব মানুষের জীবনযাপনের ধরনই পালটে দিল; তাতে ব্যাধির জগতেও ঘটে গেল বিপ্লব। বিশেষ করে, জীবাণু-ঘটিত নতুন নতুন ব্যাধি সমাজে জায়গা করে নিল। চিকিৎসাশাস্ত্রও আর আগের মতো থাকতে পারল না; আন্দাজ, অনুমান আর অভিজ্ঞতার বদলে সে জোর দিল পরীক্ষানিরীক্ষায়। পরীক্ষালব্ধ প্রমাণই এখন অন্যতম প্রমাণ।

এরপর বিদ্যুৎ আবিষ্কার, 'দ্বিতীয়' শিল্প বিপ্লবের যুগ। উৎপাদন ব্যবস্থা আরও উন্নত হল, শারীরিক শ্রমের উপর থেকে চাপ আরও কমল। শিল্পপুঁজিতে মুনাফার পরিমাণও বেড়ে গেল বিপুল গতিতে। তাতে মূলধনের চেহারাও পালটে গেছে; শুরু হয়েছে, উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যদের ধার দেওয়ার ব্যবস্থা, - 'লগ্নী পুঁজি'। অর্থনীতির কেন্দ্রীয় ক্ষমতা চলে গেল তারই হাতে। এর পরের যুগের নাম, 'মাইক্রোচিপ' আর 'ইন্টারনেট'-এর যুগ, 'তৃতীয়' শিল্প বিপ্লব। তার তাৎপর্য আরও গভীর। উৎপাদনের পিছনে শারীরিক না-হলেও বিপুল মানসিক শ্রমের যতটুকু অবদান ছিল তাও কেড়ে নিল নতুন নতুন যন্ত্র, অঙ্ক কষা, হিসেব রাখার মতো কাজগুলো এখন এল 'কম্পিউটার'-এর হাতে। তাতে লগ্নী পুঁজির ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট কমল, আবার প্রভুত্বও বজায় থাকল।

লোকায়ত ডাক্তারি শাস্ত্রগুলো এই প্রবল পরিবর্তনের সঙ্গে মানাতে পারেনি। কিন্তু আধুনিক ডাক্তারি শাস্ত্র প্রত্যেক শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেকে বিকশিত করতে পেরেছে। নতুন ধরনের অস্ত্রোপচার, নতুন ধরনের গবেষণা, ওষুধপত্র, জীবাণুর আবিষ্কার, নতুন কারিগরি, সবই আসলে শিল্পসভ্যতার দান। জীবনযাত্রা যেমন পালটিয়েছে, মানুষের প্রয়োজন আর দাবিও বেড়েছে; নতুন গবেষণার যুক্তিও তৈরি হয়েছে। তাই আধুনিক ডাক্তারির এক-একটা উল্লম্ফন প্রায় চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। কারণ, নতুন নতুন প্রযুক্তিকে আধুনিক ডাক্তারি মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছে। লোকায়ত শাস্ত্রগুলোও হাজার বছর ধরে জনমানুষের শরীরস্বাস্থ্য নিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছে, তাদের মধ্যে আবিষ্কার পর্বও চলেছে। কিন্তু তার অবয়ব ছিল কুটির শিল্পের মতো; গণ-উৎপাদনের উপায় তার ছিল না, দাবিও ছিল না; সেই কারিগরি ছিল না, দরকারও পড়েনি।

এরপর সর্বাধুনিক যুগে এসে দেখা গেল, কম্পিউটার হয়ে গেছে সর্বেসর্বা। বিশ্বময় তার জালিকা, অন্তর্জাল। বৈদ্যুতিন ব্যবস্থা এবং তথ্য-প্রযুক্তির ('ইনফরমেশন টেকনোলজি')

হাত ধরেই এসেছে এমন এক যুগ যেখানে যাবতীয় মানসিক এবং বৌদ্ধিক কর্মোদ্যোগ চলে যাবে অদ্ভুত এক যন্ত্রের হাতে, যার নাম, 'নকল বুদ্ধিমত্তা' ('আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স')। এরই নাম, 'ডিজিটাল' যুগ, 'চতুর্থ' শিল্প বিপ্লব। এখন সমস্ত কর্মকাণ্ডের তথ্য জমা থাকবে মেঘের ('ক্লাউড') কাছে, সেখান থেকে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে, ভাড়ার ব্যবস্থাও। এই যে সারা দুনিয়া দিগন্তবিস্তৃত 'ক্লাউড'-এর হাতের মুঠোয় এসে গেল সেই হাতকে নিয়ন্ত্রণ করছে মাত্র কয়েকটা কোম্পানি। পুঁজিও এখন 'ডিজিটাল'; তার এমন ক্ষমতা যে সে লগ্নী পুঁজির উপরেও খবরদারী করতে পারে।

ইতিহাসের এ এক আশ্চর্য পুনরাবৃত্তি! পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলোর জন্ম হয়েছিল নদির ধারে, উর্বর, চাষযোগ্য জমিতে। আজ এই 'চতুর্থ' শিল্প সভ্যতার যুগেও আমরা জমিতেই দাঁড়িয়ে আছি, অথচ এমন জমি যা চোখে দেখা যায় না, সে ছায়াবাস্তব ('ভার্চুয়াল রিয়ালিটি')। পুনরাবৃত্তিই, কিন্তু নতুন রূপ ধরে! ইতিহাসের গতি অমনই সর্পিল ('স্পাইরাল'); ঐতিহাসিক বস্তুবাদ!

এই 'ডিজিটাল পুঁজি'-এর ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ্বর হলেন জেফ বেজোস, বিল গেটস আর মার্ক জুকারবার্গ। আর ভারত দখলের দায়িত্ব পেয়েছে ইন্দ্র, মুকেশ আম্বানি। তাই প্রথমেই বৃত্রাসুর বধ, - 'বি এস এন এল'! ছবিটা খুবই স্পষ্ট; এই নতুন যুগে সমাজের রূপরেখা, জনমানুষের সম্পর্ক, শিক্ষা-দীক্ষার রূপ, সবই বদলে যাবে। পেশাদারী শিক্ষাও এখন 'নকল বুদ্ধিমত্তা'র দিকে তাকিয়ে থাকবে। কিন্তু আমাদের নতুন শিক্ষানীতি কি এই নতুন যুগের সঙ্গে খাপ খায়?

'চৌষট্টি কলা', বাণভট্টে ব্যুৎপত্তি আর 'আয়ুষ'-এর বরণডালা নিয়ে 'নকল বুদ্ধিমত্তা' বা 'ডিজিটাল' যুগ নিশ্চয়ই মাথা ঘামাবে না। তার চাই নতুন উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে মানানসই একটা স্বাস্থ্যবিজ্ঞান আর স্বাস্থ্য পরিষেবা। সে নিজেই তা গড়ে তুলবার কাজ শুরু করে দিয়েছে অনেকদিন। তারই নাম, 'কর্পোরেট' স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। সে স্বাস্থ্য আর অস্বাস্থ্য নিয়ে জনমানুষের স্বাভাবিক, জন্মগত ধারণাগুলোকেই পালটে দিচ্ছে। তার মুনাফার লোভ আকাশচুম্বী। সে ক্রমশ আরও ভয়ংকর, আরও সর্বনেশে হবে। তার হাতেই আমরা দেখতে পাব খণ্ডবাদী ডাক্তারি দর্শনের চূড়ান্ত পরিণতি। জনস্বাস্থ্য হবে তার প্রথম শিকার। অথচ আমরা জানি, ডাক্তারি বিজ্ঞান আসলে জন আর স্বাস্থ্যের বিজ্ঞান; নইলে সে কিছুই না। সেই জনস্বার্থ রক্ষা করতে এখন কী করা?

ডাক্তারির নতুন শিক্ষানীতিতে তার কোনও দিশা নেই, আছে অনায়াস প্রগলভতা। অথচ ডাক্তার থেকে সমাজবিজ্ঞানী, সকলের কাছে এটাই সবচেয়ে দুর্ভাবনার বিষয়। কারণ, ডাক্তারি ব্যবস্থা একই সঙ্গে সামাজিক আর সাংস্কৃতিক। নতুন, কর্পোরেট সংস্কৃতিতে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কেমন হবে তা টের পাওয়া যাচ্ছে। সেখানে প্রথাগত বিজ্ঞানের রমরমাই থাকবে। তাকে আটকাতে যদি পূর্ণতার বিজ্ঞান ('হোলিস্টিক সায়েন্স') চাই তাহলে তার চেহারা ঠিক কেমন হবে তা এখনও অস্পষ্ট। নতুন শিক্ষানীতি জনস্বাস্থ্যের উপাদানগুলোর কথা ছুঁয়ে গেছে, জনস্বাস্থ্যের মান বাড়ানই যে ডাক্তারি শিক্ষার মূল লক্ষ্য সেকথাও ঠারেঠোরে বলেছে। কিন্তু তার নিজের কোনও দিশা নেই বলে জোড়াতালি দিয়ে একটা মীমাংসায় আসার চেষ্টা করেছে। এ তো ভণ্ডামিই হল।

শিল্পপুঁজির উত্থানের পর জনস্বাস্থ্য কীভাবে অবহেলিত, বিপর্যস্ত হয়েছিল সে-ব্যাপারে যাঁরা প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন, ফ্রেডারিক এঙ্গেলস (১৮২০-১৮৯৫) আর রুডলফ ভির্কো (১৮২১-১৯০২)। তাঁরাই আমাদের জানিয়েছিলেন, পুঁজিবাদ যে-রাজনীতির পটভূমি তৈরি করে সেখানে জনস্বাস্থ্য ব্রাত্যই থাকে। ভির্কো সাহেব ছিলেন আধুনিক ডাক্তারি বিজ্ঞানের প্রবাদপ্রতিম শিক্ষক। তিনিই জানিয়েছিলেন, মহামারীর কারণ জীবাণুর মধ্যে নেই, আছে সমাজের পরিবেশের মধ্যে। বলেছিলেন, ডাক্তারি আসলে একটা সমাজবিজ্ঞান, রাজনীতি না-বুঝলে এই বিজ্ঞানও বোঝা যায় না। তাঁদেরই যোগ্য উত্তরসূরী ছিলেন, চিলির রাষ্ট্রপতি, ডাক্তার স্যালভাদর আলেন্দে (১৯০৮-১৯৭৩)।

পুঁজিবাদের ভ্রূকুটি সত্ত্বেও, লাতিন আমেরিকায় কীভাবে জনস্বাস্থ্যের সংস্কার করা যায় তার পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়েছিলেন তিনি। তার পরিণামেই বিশেষ করে, লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে আধুনিক ডাক্তারি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে জনমানুষের বিক্ষোভ সম্ভব হয়েছিল। তা ছিল বাণিজ্যবিলাসী ডাক্তারি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে। আজও সেখানে নতুন নতুন পথের খোঁজখবর চলছে। সেই কাজ কষ্টসাধ্য, কেননা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বাণিজ্যের রূপও পালটে গেছে,

বাণিজ্যের তরীতে নতুন নতুন উপাদান এসে জড়ো হয়েছে। যেমন 'আই এম এফ', 'বিশ্ব ব্যাংক', 'গ্যাট' চুক্তি এবং 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'। তাতে দেখা গেল, গত শতকের ষাটের দশকের মধ্যে আন্তর্জাতিক পুঁজি নিজেকে গুছিয়ে নিতে পেরেছে। নানান দেশে তার প্রতিবাদ, বিরক্তির প্রকাশ ঘটলেও ডাক্তারি সাম্রাজ্য তার মহিমা মোটামুটি ধরে রাখতে পেরেছে।

তাতে আমাদের দেশের হাতযশও যথেষ্ট। গেল শতকের শেষের দিকে নিজের বিপদ থেকে মুক্তির আশায় আন্তর্জাতিক পুঁজিই নিয়ে এসেছিল নতুন উদারীকরণ ('নিওলিবারাইজেশন')-এর তত্ত্ব। আমরা ঢাকঢোল পিটিয়ে তাকে সমাদর করেছি। অনেকেই তখন বুঝিনি যে, এই তত্ত্বের সঙ্গে গণতন্ত্রের ধারণা মিশতে চায় না; এখানে গণতন্ত্র একটা বিলাসিতা। সেকথা বুঝতে-বুঝতে শিক্ষাও চলে গেল 'গ্যাট'-এর হাতে, আর 'গ্যাট'-এর উত্তরসাধক হয়ে এল 'বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা'। তার নানান শর্ত, তার সঙ্গে আমাদের নানান চুক্তি। এমনকি, ২০১৫ সালে তার সঙ্গে এমন চুক্তিতে আমরা সইসাবুদ করে এলাম যেখানে নিজেদের স্বার্থই ক্ষুণ্ণ হয়। এবার তাহলে কী হবে? শিক্ষানীতি তো অর্থনীতি আর রাজনীতি থেকে আলাদা কিছু না। তাই শিক্ষানীতি তৈরির স্বাধীনতাও হারালাম।

এদিকে চাকা ঘুরছিল একবিংশ শতকের গোড়া থেকেই। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ পুরনো চুক্তির শর্ত নিয়ে সংশয় জানাল, নতুন বাণিজ্য চুক্তিতে গড়িমসি দেখাতে থাকল। শিক্ষা আর স্বাস্থ্যের গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে আমাদের দেশেও নানান আন্দোলন, বিক্ষোভ শুরু হল। আমাদের রাষ্ট্র যেমন এগুলোকে তেমনভাবে দমন করতে পারেনি, তেমনি অন্যান্য দেশেও বাণিজ্য পুঁজির সঙ্গে নানান বিরোধ তৈরি হল। ২০০৮ সালে 'বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা' অনেক চেষ্টা করেও বিরোধের সুরাহা করতে পারল না। তাই আধুনিক ডাক্তারির সাম্রাজ্যে এখন শুধু সংকট না, এ এক মহাসংকট। নিজের ধর্ম রক্ষা করতে গেলে তাকে এখন 'ডিজিটাল' যুগে যেতেই হবে। তাই 'চতুর্থ' শিল্পবিপ্লবের যুগে ডাক্তারি সাম্রাজ্যে কর্পোরেট স্বাস্থ্য ব্যবস্থাই হবে সাধারণ নিয়ম।

আমাদের সরকার যে সেই কর্পোরেট ব্যবস্থাই চায়, সেকথা প্রমাণিত; কেননা কর্পোরেটই তার জিয়নকাঠি। তাই নতুন যুগের 'ডিজিটাল' পুঁজি কীভাবে জনমানুষের স্বাস্থ্যকে নিয়ন্ত্রণ করবে সে-ব্যাপারে নতুন শিক্ষানীতি নিশ্চুপ। তার এই নীরবতা অবশ্য বাঞ্ছনীয়! এমনকি দেখা গেল, সাম্প্রতিক 'করোনা' সংকটও কর্পোরেট-সৃষ্ট, কর্পোরেট পরিচালিত, কর্পোরেট জগত তাকে ততদিন জিইয়ে রাখবে যতদিন তার দরকার। আমরা যাতে এসব কথা না তুলি সে-ব্যাপারেও নতুন শিক্ষানীতি সতর্ক। তার উদ্দেশ্য, শিক্ষার প্রাঙ্গন এলোঝেলো করে দেওয়া যাতে কর্পোরেট-এর সামনে কোনও প্রতিপক্ষ না-থাকে। নিজের সৃষ্টি দেখে সে নিজেই গেয়ে ওঠে, 'বাহবা কী ফূর্তি! অতি খাসা আমাদের বকচ্ছপ মূর্তি।' অতএব, আমাদের সামনে এখন প্রহেলিকা।

তাই মনে হয়, 'চতুর্থ শিল্পবিপ্লব', 'একবিংশ শতাব্দি', এসব শুধু কথার কথা। নতুন সভ্যতায় চাই নতুন বিশ্ববীক্ষায় সিক্ত, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, আধুনিক মননের চিকিৎসক। প্রযুক্তির যুগ; নতুন প্রযুক্তি আসতেই থাকবে। তাই, আমরা যদি জনস্বাস্থ্যের দাবি মানতে চাই তাহলে এই চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে, উন্নত প্রযুক্তিকে আর আধুনিক বিজ্ঞানকে কটাক্ষ না-করে বরং তাকে জনমানুষের স্বার্থসিদ্ধির কাজে ব্যবহার করতে হবে। তার জন্য চাই অন্য ধরনের গবেষণা; তার কোনো চিহ্ন শিক্ষানীতিতে নেই। তাহলে সরকার নতুন করে কী এমন ভাবল যা শুনে আমরা মুগ্ধ হব? হিটলারের আমলে অনুগত বিজ্ঞানীরা সৌজাত্যবাদ ('ইউজেনিক্স')-এর তত্ত্ব নিয়ে এসে লোকসাধারণকে অন্তত কিছুকালের জন্য মুগ্ধ করেছিল, বিভ্রান্তও। আমাদের শিক্ষাবিদদের সেই এলেমও দেখছি না।

আমরা জানি, নাটক হিসেবে 'মৃচ্ছকটিক' ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের ইতিহাসে কিংবদন্তীর মতো। এও জানি যে, এই নাটকের প্রেক্ষাপট ছিল খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের উজ্জয়িনী নগর। কিন্তু আমরা কি এখন সেই ধরনের নগর বানাই, না সেই ধরনের ঘরদোর? তাহলে আজকে নাটক লিখতে গেলে আমরা 'মৃচ্ছকটিক'-এর মতো লিখব কেন? আজকের নাটক হবে আজকের প্রয়োজনে, আজকের প্রেক্ষাপটে। সেই প্রেক্ষাপট বুঝতে গেলে যে উন্নত মেধার দরকার তার পরিচয় আমরা সরকারি উচ্চ মহলে পাই না, শিক্ষা কেন কোনও মহলেই না। যা পাই তাতে মনে হয়, অনাগত দিনে যেসব পেশাদার তৈরি হবেন তাঁরা বিভ্রান্ত থাকবেন, চিন্তার স্বাধীনতা তাঁদের থাকবে না। তাঁদের পদযুগলও হবে এমনই দুর্বল যে হেঁটমুণ্ড ঊর্ধ্বপদ হয়ে বিরাজ করতে হবে। কারণ, নতুন শিক্ষানীতিতে লুকিয়ে আছে আমাদের নির্ঘাত মূর্ছাযোগের অঢেল মালমশলা।

ডাক্তারির নতুন শিক্ষানীতি, আমাদের মূর্ছাযোগ

নীতিপ্রণেতারা জানিয়েছেন, নতুন যুগের শিক্ষা হবে 'হালকা', কিন্তু তাতে থাকবে 'দৃঢ়' নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা। বলেছেন, এভাবেই নাকি তাঁরা 'চরিত্রবান' 'মানুষ' তৈরি করবেন। শিক্ষণীয় বস্তুসম্ভার কীভাবে হালকা হবে তা তাঁরা বলেননি, তবে সারবত্তা না-থাকলে হালকাই হওয়ার কথা। আর নিয়ন্ত্রণের যেসব আভাস তাঁরা দিয়েছেন তাতে মনে হয়, শিক্ষা প্রাঙ্গনে নিষ্প্রশ্ন সেনানী তৈরি করাই লক্ষ্য; শিক্ষার নির্যাস নিয়ে তাঁদের তেমন মাথাব্যথা নেই। তাহলে তো বলতে হবে, যিনি প্রশ্ন তুলবেন তিনি দুশ্চরিত্র এবং অমানুষ! দেখেশুনে মনে হয়, 'বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো' কথাটা আমাদের শিক্ষাবিদরা ভুলেছেন।

ডাক্তারির নতুন বিজ্ঞানভাণ্ড হাতে নিয়ে 'বিশ্ব গুরু' হয়ে ওঠার স্বপ্নে বিভোর হতে গিয়ে তাঁরা একটা জরুরি প্রশ্নই এড়িয়ে গেছেন। তা হল, লোকায়ত চিকিৎসাপ্রথাগুলো গ্রিস, পারস্য, চিন এবং ভারতে যথেষ্ট শক্তপোক্তই ছিল। অথচ তারা কেউ আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পারল না কেন? আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম আর বিকাশ ইউরোপে ঘটল কেন? এর উত্তর না-পেলে প্রাচীন আর অর্বাচীনের মিলনে কেমন উৎকৃষ্ট ফসল উৎপন্ন হবে, তা স্পষ্ট হবে না। বহুদিন আগে এই প্রশ্নগুলো তুলেছিলেন ব্রিটিশ জীবরসায়নবিদ এবং চিনতত্ত্ববিদ, জোসেফ নীডহ্যাম (১৯০০-১৯৯৫); উত্তরও দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, সভ্যতার মনন আর সমাজ-অর্থনীতির বিশিষ্ট রূপের দিক থেকে চিন, ভারত আর ইসলামীয় সভ্যতা পুঁজিবাদের উত্থানের জন্য তৈরি ছিল না।

আরেকটু বিশদে বলতে গেলে, আসল উত্তর লুকিয়ে আছে তিনটি নদীর বুকে,—নিল, ইয়াংসি আর গঙ্গা। এই তিনটি নদী তাদের দুই পাড়ের জনমানুষকে কোনোদিন নিরাশ করেনি; জনমানুষ ছিলেন আত্মতুষ্ট, আত্মনির্ভর। সকলে সর্বদা খুব সচ্ছল না-থাকলেও তাঁদের মধ্যে হতাশা জাগেনি, নৈরাশ্যও না। নিজেদের বিজ্ঞান চেতনা নিয়েও তাঁরা তুষ্টই ছিলেন, আবার একই সঙ্গে প্রতিবেশীর বিজ্ঞান চেতনা নিয়েও তাঁদের কৌতূহল ছিল। রোগ-বিরোগ এবং জনস্বাস্থ্যের সমস্যার নিরসন ঘটেছে কাল থেকে কালান্তরে, শাসকের চরিত্র অনুযায়ী। অমন আত্মতৃপ্ত সভ্যতায় তথাকথিত আধুনিক বিজ্ঞানের দরকারও ছিল না। উলটোদিকে, সামন্তবাদ ধ্বংস করে, নতুন উৎপাদন ব্যবস্থা তৈরি না-করলে ইউরোপের পক্ষে টিকে থাকা অসম্ভব ছিল; নতুন ব্যবস্থায় নতুন ডাক্তারি বিজ্ঞানেরই নির্ঘাত দরকার ছিল।

অবশ্য তিনটি নদী যেমন আমাদের সন্তুষ্টির কারণ তেমনি সর্বনাশেরও। আত্মগরিমা আর আত্মরতিতে আচ্ছন্ন থাকা সর্বনাশের নমুনা। সেই আচ্ছন্নতা আজও কাটেনি। আধুনিক বিজ্ঞানের উদ্যানে তাদেরকে নিয়ে এলেই আচ্ছন্নতা কাটবে না, কেননা প্রাচীন আর অর্বাচীনের ফারাক শুধু কালের নিরিখে না, ফারাক দৃষ্টিভঙ্গিতে, রোগ-বিরোগ নিয়ে বিশ্লেষণে। অথচ ওই লোকায়ত দৃষ্টিভঙ্গিগুলো চরিত্রের দিক থেকে বস্তুবাদীই ছিল। প্রাচীন, গ্রিক চিকিৎসাবিদ্যা জানিয়েছিল, আমাদের শরীরে 'চারটি ধাতুর' ('ফোর হিউমরস') ভারসাম্যের কথা। আয়ুর্বেদ জানিয়েছে 'ত্রিদোষ'-এর কথা। আর চৈনিক চিকিৎসাবিদ্যায় ছিল 'য়িন-য়াং' নামে দুই বিরোধী শক্তির আন্তঃসম্পর্কের তত্ত্ব। আধুনিক ডাক্তারি শাস্ত্র এই ধারণাগুলোকে আত্মস্থ করেছে, তারপর তাদেরকে আরও বিকশিত করে, যুক্তিগ্রাহ্য অবস্থান নিতে পেরেছে।

তার মানে, আধুনিক বিজ্ঞান তার পূর্বপুরুষকে অগ্রাহ্য করেনি; বরং সময়ের দাবিতে সাড়া দিয়েছে। সাড়া দেওয়ার প্রবণতা তার মধ্যেই আছে। সে খণ্ডবাদের চর্চা করে ঠিকই, কেননা ফরাসি দার্শনিক, অঙ্কবিদ ও বিজ্ঞানী রেনে দেকার্ত (১৫৯৬ - ১৬৫০) শিখিয়েছিলেন, মানব শরীর শুধু পেশি, স্নায়ু, রস, রক্ত, অস্থি আর ত্বকের মতো বিচিত্র উপাদানে তৈরি একটা বিশেষ যন্ত্র। এই যন্ত্রটির প্রতিটি উপাদানকে গভীরভাবে বুঝতে পারলে আমরা পুরো শরীরটা নিয়ে স্পষ্ট ধারণা পেয়ে যাব। এইভাবে খণ্ডবাদ মানুষকে স্বাভাবিক আর অস্বাভাবিক, দুই ভাগে ভাগ করে নেয়, তার পূর্ণসত্তার কথা ভুলে যায়। সে ভাবে, এই যন্ত্রটিকে ঠিকমতো নাড়াচাড়া (ম্যানিপুলেট) করলেই জীবনের অনিশ্চয়তা ('আনসার্টেইনটি') থেকে মুক্তি পাব।

কিন্তু দীর্ঘকাল নাড়াচাড়া করেই বোঝা গেল, মানব শরীরের বুনিয়াদি উপাদান আসলে অণু-পরমাণু; তারই মধ্যে খেলা করে পদার্থবিদ্যা আর রসায়নের সূত্রগুলো। সেখানে অনিশ্চয়তাই চূড়ান্ত সত্য। তার চর্চাই আধুনিকতা। 'সমগ্র' মানে শুধু অংশের যোগফল না, তার চেয়ে বেশি কিছু। এই ধারণার বীজ আধুনিক ডাক্তারি শাস্ত্রেই ছিল, সেখানেই তার স্ফুরণ ঘটছে। এমনকী, ১৮০৫ সালেই তৎকালীন, বিখ্যাত

ডাক্তারি পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রশ্ন তুলেছে, নিশ্চয়তা বলে কি ডাক্তারি বিজ্ঞানে কিছু আছে? ডাক্তারি প্রতিষ্ঠান এই বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গিকে আমল দেয়নি, দমন করেছে, তার কারণও ছিল। কিন্তু বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গির বিনাশ হয় না; ডাক্তারি পত্র-পত্রিকায় বারবার এই মর্মে আলোচনা হয়, গবেষণাও চলে।

খণ্ডবাদী দর্শনের দুর্বলতা ধরিয়ে দিয়ে আধুনিক, উদার চিন্তার প্রসারের জন্য আমরা অসংখ্য মনিষীর কাছে চিরঋণী। তাঁরা আমাদের শিখিয়েছেন, ডাক্তারি একটা অনিশ্চয়তার বিজ্ঞান আর সম্ভাব্যতার শিল্প। নিশ্চয়তা, অতুল সুখ আর সমৃদ্ধির লোভ দেখালে বুঝতে হবে, রাষ্ট্র সর্বগ্রাসী হতে চাইছে। রাষ্ট্র জনমানুষের স্বাস্থ্য চায় না, সে চায় 'স্বাস্থ্যবাদ' ('হেলথিজম')-এর প্রচার। 'স্বাস্থ্যবাদ' মানে, জনমানুষের উপর জবরদস্তি যাতে স্বাস্থ্যবাণিজ্য আরও ফুলে-ফেঁপে ওঠে। 'স্বাস্থ্যবাদ' সুখ আর স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা তৈরি করে, সেই মাপকাঠিতে জীবনটা যাপনের নিয়ম বানিয়ে দেয়। তা মানলেই সুনাগরিক, নইলে বর্বর। অথচ সৌন্দর্য, প্রেম আর সুখানুভূতির মতো স্বাস্থ্যেরও কোনও সংজ্ঞা হয় না, সুখেরও না, মাপকাঠি বলেও কিছু হয় না।

এই চ্যালেঞ্জগুলোই ডাক্তারি বিজ্ঞানে পূর্ণতাবাদকে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম। এই সংগ্রামের গতি এখনও অতি মন্থর; কিন্তু গতিটা সত্যি। এভাবেই একটা নতুন, পালটা প্রতিষ্ঠান 'ডিজিটাল' যুগে জনমানুষের স্বার্থ রক্ষা করতে পারে। কিন্তু জনবিরোধী সরকার সেই পথে হাঁটতে চায় না, তাই নতুন শিক্ষানীতিতে এসব প্রসঙ্গই নেই। তাতে প্রমাণ হয় যে, সরকার আধুনিক, যুক্তিগ্রাহ্য পথের পথিক না, পথ খনন করার অভ্যেস তার নেই। তার বদলে সে কথায়-কথায় 'বৈদিক' যুগের ধুয়ো তোলে। অথচ সেখানেও নির্বুদ্ধিতা চাপা থাকে না। আগ্রহের আতিশয্যে খেয়ালই নেই যে, লোকায়ত চিকিৎসাগুলোর সবকটিকে 'বৈদিক' যুগের পটভূমিতে রাখা যায় না। য়ুনানি চিকিৎসা প্রথা ইসলামীয় সভ্যতার অঙ্গ, আর হোমিওপ্যাথি তো মোটেই প্রাচীন কিছু না।

আর যদি প্রাচীনের প্রতিই এত ব্যাকুলতা তাহলে প্রাচীন মিশরীয় এবং চৈনিক চিকিৎসা প্রথার কথা ভুলে গেলে চলবে? শুধু তাই না; যাবতীয় চিকিৎসাপ্রথার অগ্রদূত যে 'ডাইনীবিদ্যা' বা 'যাদুকরী বিদ্যা' ('উইচক্র্যাফট'), সেও তো সত্যি। সেকথা নতুন শিক্ষার্থীকে জানাতে হবে না? যাদুকরী বিদ্যা অশুভ আত্মা আর অলৌকিক কিছুর মধ্যে রোগের কারণ খুঁজেছিল ঠিকই, কিন্তু সেটাই ছিল বিজ্ঞানের আদিমতম রূপ। 'কারণ' খোঁজার চেষ্টাটাই ছিল বৈপ্লবিক; আধুনিক ডাক্তারি বিজ্ঞান আজও সেই চেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছে, নক্ষত্রমণ্ডলীর বদলে সমাজের শরীরে। এই বিদ্যারই একটা রূপ প্রকৃতির মধ্যে ওষুধের উপাদান খুঁজেছে। সেই অন্বেষণ থেকেই পরের যুগে পর্যবেক্ষণ আর নীরিক্ষণের যুক্তি এসেছে।

তাহলে তো বলতেই হয়, ডাকসাইটে শিক্ষাবিদদের এই শূন্যগর্ভ ইতিহাস চেতনার ভাগীদার হলে আমাদের মূর্ছাযোগ নিশ্চিত।

তাহলে কোথায় এসে দাঁড়ালাম?

ডাক্তারি বিজ্ঞানের দুই রূপ। একটি রূপ বোধ জাগায়, প্রজ্ঞা দেয়, মোহ থেকে মুক্তি দেয়; অন্যটি কারসাজি ('ম্যানিপুলেশন') করতে শেখায়, মুনাফা দেয়, ক্ষমতা দেয়, বিড়ম্বনাও দেয়। দুই রূপ অবিচ্ছেদ্য; তবে আধুনিক ডাক্তারি বিজ্ঞান দ্বিতীয় রূপের প্রতি মোহগ্রস্ত। কিন্তু কারসাজির অভ্যেস শুধু বস্তুর মধ্যে সীমিত থাকে না, জনমানুষের মধ্যেও কারসাজিই করে যেতে হয়। আর তখনই ঘটে যায় মানবিকতা আর মননশীলতার মহানিষ্ক্রমণ। 'ডিজিটাল' যুগের কর্পোরেট স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সেই পথই আরও সুগম করবে। তার মহড়াও শুরু হয়েছে। লেখাপড়ার ছায়াবাস্তব ('ভারচুয়াল') রূপ যে কেমন হতে পারে তার নমুনা আমরা দেখছি, অনুরূপ ডাক্তারিও শুরু হয়ে গেছে। অনেকে ভাবছেন, যা হাতেগরম তাই তো আধুনিক।

কর্পোরেট সাম্রাজ্যও একই কথা বলে। শিক্ষক আর শিক্ষার্থীর মতো রোগী আর ডাক্তারের সাক্ষাৎ সম্পর্ক যে কতটা অপরিহার্য সেকথাই তারা ভুলিয়ে দিতে চায়। আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে, 'দূর দ্বীপবাসিনী' হয়ে গেলেই তাদের লাভ। অথচ যুগ পালটায়, সময় পালটায়; মানুষের বুনিয়াদি দোষ, গুণ আর আকুতিগুলো পালটে যায় না। শিক্ষা আর ডাক্তারির বুনিয়াদি ধর্মও পালটে যায় না। নতুন শিক্ষাবিদরা কি এসব নিয়ে আদৌ ভেবেছেন?

অনেকে ভাবেন, শিক্ষাবিদরাও তো উচ্চ শিক্ষিত, তাঁরা কি আর সমাজের সর্বনাশ করতে পারেন? কিন্তু ইতিহাস তো একথাই বলে যে, এযাবৎ সমাজসংসারের যাবতীয় সর্বনাশ শিক্ষিতদের হাতেই হয়েছে, অশিক্ষিতদের তেমন অবদান

নেই। শিক্ষার অধিকার যে আর্থিক যোগ্যতার নিরিখেই বিচার করা হবে সেই ইশারা নতুন শিক্ষানীতিতেই আছে। ডাক্তারি শিক্ষাতেও তার অন্যথা হবে না। তাহলে সর্বনাশের বাকি থাকল কী? অথচ আমরা তো চাই, 'অযোগ্যের' বাঁচার অধিকার, আমরা গণতন্ত্র চাই।

তার মানে, আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি তার চেয়ে আরও বড় বিষয় হল, আমরা কোনদিকে যাচ্ছি। সেটা বুঝতে গেলে চাই আধুনিক মনন; শিক্ষানীতিতে তার নজির নেই। তার লক্ষ্য, রাজনৈতিক ফায়দার দিকে। তাই ২০৩০ সালের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া। এই দলিল ন্যায়ধর্মের কথা বলে, সভ্যতার কথাও; অথচ সভ্যতা মানে ন্যায়বিচার না, সুস্বাস্থ্য না, চৌষট্টী কলায় পারদর্শী হওয়াও না। সভ্যতা হল, জিজ্ঞাসার জন্মভূমি। ডাক্তারিও কোনও গুহ্য মন্ত্রবিদ্যা না, কঠোর আইনের শাসনও না; ডাক্তারি একটা অমলিন যত্নশাস্ত্র।

প্রাচীন বিদ্যার নানান শাখা-প্রশাখার ঘন অরণ্যে পায়চারি করে তার খোঁজ মিলবে না। নতুন যুগে, জনমানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার অচিন সুরধুনীর খবর সেখানে পাওয়া যাবে না। এই মর্মান্তিক অবস্থায় যত্নশাস্ত্র আর যত্নবুদ্ধিকে যে বাঁচিয়ে রাখতে পারে তার নাম, প্রজ্ঞা। আমাদের সরকারি মহলে তার চির আকাল।

প্রাসঙ্গিক রচনাবলী

1. Daya Ram Varma. The Art and Science of Healing Since Antiquity. Xlibris; 3 February 2011.
2. Daya Ram Varma. From Witchcraft to Allopathy. Uninterrupted Journey of Medical Science. Economic and Political Weekly. 41 (2006V) 3,605 – 3,611.
3. Derek Gatherer. So What Do We Really Mean When We Say that Systems Biology is HolisticÚ BMC Systems Biology. 4, Article 22, 2010.
4. Editorial. Is There Certainty in Medical Science? Edinburgh Medical and Surgical Journal– 1805 Oct 1; 1(4) 425–429.
5. Howard Waitzkin. Medicine and Public Health at the End of Empire. Routledge, Ed I, October 30, 2011.
6. I Illich. Medical Nemesis. The Expropriation of Health.. London Calder and Boyars, 1975.
7. James Le Fanu. The Rise and Fall of Modern Medicine. London Little, Brown, 1999.
8. Keshri VR et al. Reforming the regulation of medical education, professionals and practice in India. BMJ Global Health 2020; 5:e002765.
9. Kothari ML, Mehta LA. Medical education an epistemiological enquiry. J Postgrad Med [serial online] 1993.
10. KR Popper. The Open Society and Its Enemies. Vol 2. Ed 5, London Routledge and Kegan Paul, 1966, p-304.
11. National Education Policy 2020. Ministry of Human Resource Development. Government of India. 4.4., 11.1, 11.3, 11.4, 12.7, 12.8, 17.4., 18.3., 20.1, 20.2, 20.5.
12. National Education Policy 2020: Notes on how to read a policy document. https//www.groundxero. in/2020/08/06/
13. Petr Skrabanek. The Death of Humane Medicine and The Rise of Coercive Healthism. Social Affairs Unit. (British Library Cataloguing in Publication Data) 1994.
14. Praveen Kulkarni, K. Pushpalatha, Deepa Bhat. Medical Education in India: Past, Present and Future. APIK J Int Med 2019;7:69-73.
15. R Krishna Kumar. Integrating medical education with societal needs. Indian Journal of Medical Ethics Vol IX No 3 July-September 2012.
16. Report of the Committee on Research in Ayurveda, 1948.
17. Soham D. Bhaduri. Fusing traditional medicine with the modern. Source www.thehindu.com, Date: 2019-11-05.
18. Tim Evans. Rise of the Therapeutic State: New Challenges for TwentyéôéFirstéôéCentury Medicine. Economic Affairs, Vol. 28, Issue 4, pp. 22-26, December 2008.
19. পরশুরাম। ডাক্তারি ও কবিরাজি। লঘুগুরু প্রবন্ধাবলী। প্রবাসী; ফাল্গুন, ১৩৩১ (১৯২৪)।
20. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গান্ধারীর আবেদন। রবীন্দ্র রচনাবলী।